'ভারত-বাংলাদেশ বাণিজ্য সংকট ভারতের আগ্রাসী নীতির কারণে'

শময়িতা চক্রবর্তী

***ডয়চে ভেলে**: যত দিন যাচ্ছে ভারত-বাংলাদেশ বাণিজ্য সম্পর্ক ততই একটি অনমনীয় পরিস্থিতির দিকে এগোচ্ছে। সম্প্রতি ভারত আরো বেশ কয়েকটি বাণিজ্য নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। দুই দেশে এর প্রভাব কী?*

জহর সরকার: প্রথম যে বিষয়টি মনে রাখা দরকার, উপমহাদেশে বাণিজ্যিক ভারসাম্য ভারতের অনুকূলে। ভারত বাংলাদেশ থেকে যে পরিমাণ জিনিস আমদানি করে, তার চেয়ে অনেক গুণ বেশি রপ্তানি করে। বাংলাদেশ বেশ কিছু ভারতীয় পণ্যের উপর নির্ভরশীল। যদিও সম্প্রতি বাংলাদেশ কিছুক্ষেত্রে এই ভারত-নির্ভরশীলতা খানিকটা কমাতে পেরেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও বাংলাদেশ বরাবরই ভারতের সঙ্গে ফ্রি ট্রেড বা মুক্ত বাণিজ্য নীতি চেয়ে এসেছে। বাংলাদেশের বর্তমান শাসকও নীতিগতভাবে তা চান বলেই আমার ধারণা। উল্টো দিকে বাংলাদেশের পণ্য গোটা ভারতের কাছে সার্বিকভাবে তত গুরুত্বপূর্ণ না হলেও উত্তর-পূর্ব ভারতে এবং পশ্চিমবঙ্গে বাংলাদেশের পণ্যের ব্যাপক চাহিদা আছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ভারতের এই অঞ্চলও বাংলাদেশের পণ্যের উপর নির্ভরশীল। ফলে বাণিজ্য পথের উপর নিষেধাজ্ঞা তৈরি হলে তার প্রতিফলন দুই দেশের বাজারের উপরই পড়বে। জিনিস-পত্রের দাম বাড়তে শুরু করবে এবং শেষ পর্যন্ত সাধারণ মানুষ ভুক্তভোগী হবেন। ভারত এবার যে পদক্ষেপগুলি নিয়েছে, দুই দেশের বাজারেই তার প্রভাব পড়বে বলে আমার আশঙ্কা। ঠিক এই কারণেই আমি ভারতের এই নীতিকে সমর্থন করি না। কারণ, যে মুহূর্তে সাধারণ মানুষ অসুবিধায় পড়বেন, তখনই চরমপন্থিদের প্রোপাগান্ডা মানুষের মনে গুঁজে দেওয়া সহজ হবে। বাংলাদেশে ভারতবিদ্বেষ আরো ছড়াবে, ভারতেও বাংলাদেশবিদ্বেষ ছড়ানো সহজ হবে। দুই দেশেই এমন পরিস্থিতির জলহাওয়া তৈরি হয়ে আছে।

এমন পরিস্থিতি যে তৈরি হতে পারে, ভারত কি তা জানে না? তাহলে এই নীতিগুলি নেওয়া হচ্ছে কেন?

সমাজনীতিতে একটি 'লঙ্ঘ্য' ব্যবহার করা হয়। 'কল বন্ধের' নীতি। অর্থাৎ, অন্যকে সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা। ভারত বাংলাদেশের সঙ্গে বাণিজ্যক্ষেত্রে এখন যে কাজটি করছে, তাকে কল বন্ধের নীতি বলা যায়। একজন সাবেক আমলা হিসেবে বলতে পারি, ভারতীয় কূটনীতিতে বা ভারতীয় আমলাতন্ত্রে এই নীতির ব্যবহার প্রাচীন। অতীতে নেপালে ভারত এ কাজ করেছে। বাণিজ্য বন্দর বন্ধ করে নেপালে পণ্যের রপ্তানি বন্ধ করার ইতিহাস আছে। এর ফলে নেপালের সাধারণ মানুষের মধ্যে ভারতবিদ্বেষ ছড়িয়েছে, যার জন্য ভারত সম্পূর্ণভাবে দায়ী। এই ঔদ্ধত্য ভারতের দেখানো উচিত হয়নি। আসলে এটাই চরমপন্থিরা চায়। ফলে ভারতের এই কাজকে আমি সঠিক কূটনৈতিক পদক্ষেপ বলে মনে করি না।

ভারতের প্রাক্তন কেন্দ্রীয় আমলা এবং প্রাক্তন তৃণমূল সাংসদ জহর সরকার

জহর সরকার,ভারতের প্রাক্তন কেন্দ্রীয় আমলা এবং প্রাক্তন তৃণমূল সাংসদ ছবি: Satyajit Shaw/DW

এর বিকল্প রাস্তা কী হতে পারে বলে আপনার মনে হয়?

কোনো উত্তেজনার পরিস্থিতি তৈরি হলে আমি সবসময় দুই পক্ষকে পরামর্শ দিই, তারা যেন এক গ্লাস করে জল খেয়ে আসে, তাতে উত্তেজনা প্রশমিত হয়। ভারতের আরেকটু ধৈর্য দেখানো প্রয়োজন ছিল। বাংলাদেশে এই মুহূর্তে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার চলছে, ভোটে জেতা সরকার নয়। এটি একটি সাময়িক পরিস্থিতি। বাংলাদেশের সাধারণ জনগণ কী চাইছেন, তা ভোট না হলে বোঝা যাবে না। আমাদের ভোট পর্যন্ত ধৈর্য ধরা প্রয়োজন ছিল। আমাদের যথেষ্ট ঔদার্য দেখানো উচিত ছিল। বাণিজ্য বন্দরের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি একটি বড় কূটনৈতিক পদক্ষেপ। এই সময়ে এই কাজের প্রয়োজন ছিল বলে আমি মনে করি না।

কিন্তু বাস্তব হলো, ভারত এই পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এর ভবিষ্যৎ কী বলে আপনার মনে হয়? আরো সহজ ভাষায় যদি জিজ্ঞেস করি, এর শেষ কোথায়?

বাণিজ্য-যুদ্ধ হাতুড়ি মেরে হয় না, শেষপর্যন্ত আলোচনার টেবিলে বসতে হয়, যেখানে দরকষাকষির মাধ্যমে একটি সমাধানসূত্রে পৌঁছানো যায়। ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে বিশেষ করে বাণিজ্যনীতি নিয়ে এই আলোচনা শুরু হওয়া খুব জরুরি। মনে রাখতে হবে, বাংলাদেশের বর্তমান শাসকের সঙ্গে আমাদের লেনদেন কম। বাংলাদেশের সাধারণ মানুষকে খেপিয়ে তুললে, তা শেষ পর্যন্ত ভারতের ভবিষ্যতের জন্য ভালো নয়। আমার মতে, বাংলাদেশ নিয়ে এখন ভারতের ধীরে চলো নীতি অবলম্বন করা উচিত। নির্বাচন পর্যন্ত জল মেপে তারপর পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া ঠিক হবে।

বাণিজ্য ছাড়াও ভারতের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ আরো কয়েকটি অভিযোগ সামনে আনছে,যার মধ্যে সাম্প্রতিকতম অভিযোগটি হলো 'পুশ ইন' নিয়ে। আপনার কী মনে হয়, ভারতের এই পদক্ষেপও আসলে বাণিজ্যনীতির সঙ্গে জড়িত? অর্থাৎ, বাণিজ্যনীতি একটি বিচ্ছিন্ন বিষয় নয়, একটি সার্বিক কূটনীতির অংশ?

আমি কোনো নির্দিষ্ট ঘটনার কথা বলতে চাই না। তবে সম্পর্ক যখন খারাপ হয়, তখন অনেক ঘটনা একসঙ্গে ঘটতে থাকে। এই সম্পর্ক খারাপ হওয়ার পিছনের ইতিহাসটা দুঃখজনক। ভারতের একজন নাগরিক হিসেবে আমার মনে হয়েছে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী শুরুর দিকে সাবেক বাংলাদেশ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে যেভাবে সমর্থন দেখিয়েছিলেন, তা নিয়ে অনেকের মনেই কিছু সংশয় তৈরি হয়েছিল। একথা সত্য, ভারতের অনেক মানুষেরই শুরুর দিকে হাসিনা সরকারের প্রতি সমর্থন ছিল। আওয়ামী লীগের একটা গুণ, যে তারা ধর্মনিরপেক্ষতায় বিশ্বাস করে। সেটা তারা অনেকাংশে প্রমাণ করেছে। কিন্তু এই একটা গুণ দিয়ে তো সম্পর্ক হয় না। পরে আওয়ামী লীগ সম্পর্কে অনেক তথ্য বাইরে এসেছে। তাদের সহিষ্ণুতার অভাব, অত্যাচার, বাকস্বাধীনতার উপর আক্রমণ, সাংবাদিকদের জেলে ঢোকানো, বিরুদ্ধ-স্বর চাপা দেওয়া-সহ একাধিক বিষয় বাইরে আসতে শুরু করে। এর ফলে, ভারতের গণতন্ত্রপ্রিয়, ধর্মনিরপেক্ষ জনগণ হাসিনা সরকারের প্রতি সহানুভূতিশীল আর থাকেনি। শেখ মুজিবের শাসনকালের শেষ দিকেও এমন অভিযোগ উঠেছিল। বলা হয়, সে তথ্য ইতিহাসে ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।

আমি বাংলাদেশে নানান অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ পেয়ে গেছি। সাধারণ ভাবে ভারতের প্রতিনিধি হয়েই সেখানে গেছি। ভারত থেকে গেছি বলে আমাকেও কিন্তু সেখানে অনেক বাজে কথা শুনতে হয়েছে। এই শোনার মাধ্যমে বুঝতে পেরেছি, বাংলাদেশে ভারত-বিদ্বেষী মনোভাব ক্রমশ জোরালো হচ্ছে। এর দায় ভারতকেও নিতে হবে। একদিকে বাংলাদেশে লুঠতরাজের রাজত্ব চলেছে, ক্রোনি ক্যাপিটালিজম শুরু হয়েছে, যাকে তাকে জেলে ভরা হচ্ছে আর অন্যদিকে ভারত হাসিনাকে সমর্থনের নামে এই কাজগুলিকেও সমর্থন করছে। ভারতের এটি একটি কূটনৈতিক ভুল বলেই আমার মনে হয়। অবিশ্বাস এই পরিমাণ বাড়ল যে, হাসিনা যে কাজ নিজে করেছেন, যার সঙ্গে ভারতের কোনো সম্পর্ক নেই, তার দায়ও আমাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে।

ভারতের প্রতি এই বিদ্বেষের অনেক ন্যায্য কারণও আছে। অনেকেই মনে করেন, মোদীর আসল লক্ষ্য ছিল ওখানে আদানিকে বিদ্যুৎ প্রকল্পের কন্ট্রাক্ট পাইয়ে দেওয়া। এটা আমাদেরও চোখে লেগেছিল। আমরা অনেকেই দেখলাম, প্রাথমিক আলোচনায় যেটা জয়েন্ট পাওয়ার প্রজেক্ট হওয়ার কথা ছিল, সেটা সরকারি না হয়ে বেসরকারি উদ্যোগ হয়ে গেল। কেন হল? এসব কারণেই বাংলাদেশের মানুষ ভারতের উপর চটে গেলেন।

অন্যদিকে, বাংলাদেশে উগ্র মৌলবাদের উত্থান অনেক দিনের। আমি যদি মুজিব বা শেখ হাসিনার ইতিহাস নিয়ে চর্চা করি, তাহলে রাজাকারদের ইতিহাসও উপেক্ষা করলে চলবে না। তাদের উগ্রবাদের বিরুদ্ধেও সরকার সেই অর্থে কোনো ব্যবস্থা নেয়নি।

বর্তমানে ভারত-বাংলাদেশের যে সম্পর্ক তার পিছনে এই সমস্ত বিষয়গুলি একসঙ্গে কাজ করছে বলে আমার বিশ্বাস। ফলে বাণিজ্য সম্পর্ক, সীমান্ত সম্পর্ক, পুশ ইন, পুশ ব্যাক-- এই বিষয়গুলিকে আলাদা করে দেখলে হবে না। সবকিছুকেই একই আধারে ফেলে দেখতে হবে।

বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যের গতিপ্রকৃতি

চীনের পরই বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি পণ্য আমদানি করে ভারতের কাছ থেকে। ভারতে বাংলাদেশের রপ্তানি সেই তুলনায় অনেক কম হলেও চলতি অর্থবছরে তা বাড়ার প্রবণতা দেখা গেছে। কিন্তু সাম্প্রতিক টানাপোড়েনে সেই ধারাবাহিকতা কি ধরে রাখা যাবে?

ছবি: Amlan Biswas/Pacific Press/picture alliance

সীমান্তে বিএসএফ-বিজিবির যৌথ অনুষ্ঠান

8 ছবি

ভারতের পার্লামেন্টে বা প্রশাসনের অন্দরে এই কথাগুলি আগে তোলা হলো না কেন?

অনেক বিষয় ভারত-বাংলাদেশের সম্পর্কে ব্যাকফায়ার করেছে। আমরা কিন্তু অনেক আগেই একথা বলেছিলাম। কোনোভাবেই উগ্র সাম্প্রদায়িক শক্তিকে উপেক্ষা করা যায় না। এটা ধরে নেওয়া যায় না যে, ওদের অস্তিত্ব নেই। ধর্মের বিভাজন না থাকলে বাংলা বিভাজন হতো না। একই সঙ্গে এটাও সত্যি যে, গত ৫০ বছরে বাংলাদেশে এক বিশাল মধ্যবিত্ত জনজাতি তৈরি হয়েছে, যারা সাম্প্রদায়িক নয়। তারা সংস্কৃতিমনস্ক শিক্ষিত মানুষ। যারা অনেকেই শাহবাগ আন্দোলনের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়েছিলেন। আজ আওয়ামী লিগের পাপের কারণে তারা মার খাচ্ছেন। ভারত আওয়ামী লীগের পাশে থেকেছে, সেই কারণে বাংলাদেশের এই অংশের জনগণের একটি বড় অংশ ভারত বিরোধী। বাংলাদেশের বর্তমান পরিচালকেরাও এই মনোভাবের দ্বারা চালিত বলে আমার মনে হয়। ফলে সেখানে একটি চীনপন্থি বাণিজ্য-আবেগ তৈরি হয়েছে। ভারতের পণ্য বর্জন করার মতো আহ্বান জানানো হয়েছে বিভিন্ন স্তর থেকে।

অন্যদিকে, ভারতে এই মূহুর্তে ক্ষমতায় আছে যে দল, তাদের পিছনেও সাম্প্রদায়িক ছাপ লেগে আছে। তাদের মদতে সংখ্যালঘুদের উপর বিদ্বেষ তৈরি হয়েছে। কোনো বড় দাঙ্গা না ঘটলেও ছোট ছোট ঘটনার মাধ্যমে এই বিদ্বেষ ক্রমশ বাড়ছে। যার সরাসরি প্রভাব পড়ছে প্রতিবেশী দেশগুলির উপর। এটা হওয়ারই ছিল।

আর এর প্রভাবেই বাংলাদেশ চীনের দিকে ঘেঁষছে। বাণিজ্যিক সম্পর্ক বাড়াতে চাইছে। ভারত সে কথা বুঝে, বাংলাদেশকে সবক শেখাতে যে নীতিগুলি নিচ্ছে, তাতে এই দূরত্ব আরো বাড়বে বলেই আমরা মনে হয়। যার সরাসরি প্রভাব দুই দেশের সমাজকে আরো বেশি উত্তপ্ত করবে বলে আমার আশঙ্কা।

প্রতিবেশীদের সম্পর্ক খারাপ হওয়াতে কি ভারত উপমহাদেশে একঘরে হয়ে পড়ছে?

কেবলমাত্র উপমহাদেশে নয়। অপারেশন সিন্দুরের পরে বিশ্বেও ভারতকে নানা প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হচ্ছে। ভারতের পররাষ্ট্র নীতি নিয়ে আমি অনেক লেখা লিখেছি। এই উগ্র জাতীয়তাবাদ দেশের মানুষকে প্রভাবিত করলেও, বিদেশের মানুষ বিষয়টিকে ভালো চোখে দেখে না। আগ্রাসী পররাষ্ট্রনীতি শেষ পর্যন্ত মানুষ পছন্দ করে না। ভারতের ক্ষেত্রে সেটাই হচ্ছে।

প্রতিবেশী দেশের ক্ষেত্রে বিষয়টি আরো গুরুত্বপূর্ণ। বড় দেশের সঙ্গে ছোট প্রতিবেশীর একটু ঝামেলা লেগেই থাকে। এখানে বড় দেশটিকে বড় মনের দেশ হতে হয়। উদার হতে হয়। আমাদের ক্ষেত্রে তা হয় না। তাই সবার বিরূপভাজন হতে হচ্ছে আমাদের। নেপালে প্রায় প্রতিটি রাজনৈতিক দল ভারত বিরোধী। ভুটানের সঙ্গে সম্পর্ক ভালো। বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ক ক্রমশ তলানির দিকে যাচ্ছে। বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে ভারতের ঢুকে পড়া বড় ভুল। এটা পাপ। পাকিস্তানের সঙ্গে প্রায় যুদ্ধ লাগছিল। চীন পাকিস্তানের পাশে কীভাবে দাঁড়িয়েছে, তা বিশেষ দ্রষ্টব্য। শ্রীলঙ্কার সঙ্গে তামিল ইস্যু নিয়ে বহুদিনের ক্ষোভ ভারতের। এখন তাদের অর্থনীতি খারাপ হওয়াতে আর ভারত সাহায্য করাতে খানিকটা স্বাভাবিক সম্পর্কে পৌঁছানো গেছে। তবে তাদের সঙ্গে চীনের সম্পর্কও ভালো। মালদ্বীপের সঙ্গেও খারাপ হয়েছে ভারতের সম্পর্ক। চীন সেখানেও ঢুকে বসে আছে।

আমরা কিন্তু এখনো অনেক প্রতিবেশী দেশকে সাহায্য করি। কিন্তু ভারতের এই আগ্রাসী পররাষ্ট্রনীতির কারণে ওই সাহায্যগুলির কথা সামনে আসে না। এতে আমাদের লাভ হচ্ছে না। আগ্রাসী বাণিজ্য নির্ভর সম্পর্ক দিয়ে প্রতিবেশীদের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক তৈরি করা যায় না। চেক অ্যান্ড ব্যালেন্সের বাইরে গিয়ে মানবিকতার সম্পর্ক তৈরি করতে হয়। বড় দেশকে একটু বেশি কিছু দিতে হয়। বুকের ছাতি বড় হতে হয়। নাহলে ট্রাম্পের মতো অবস্থা হবে। প্রতিবেশীরা অপছন্দ করবেই।